Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৮ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই শ্রাবন, ১৪২৯ / 24.07.2022

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
সন্ধ্যা - Evening	শ্রী অরবিন্দ
মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ	স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি
বিবেকানন্দ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন	শ্রী সুনীলকুমার দাস
সাধু নাগ মহাশয়ের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
বন্ধু	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

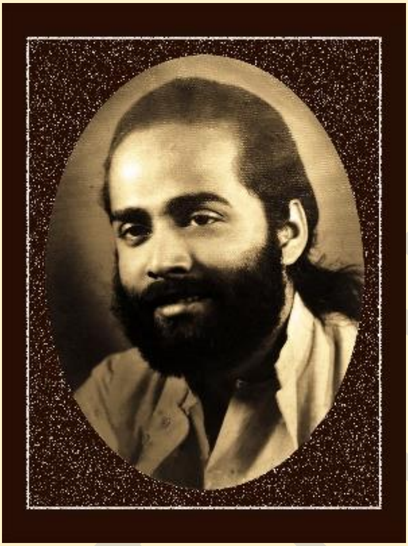

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি-কণা

“কর্মক্ষেত্রে ও সংসারে প্রকৃতির লীলা নিম্নমুখী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তোমায় নিশ্চেষ্ট করে দেবে - হতাশা এনে দেবে - দুর্বিপাকের ও শত্রুতার দ্বারা তোমার সত্য কর্মের ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সর্বদা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

যদি তুমি তোমার পুরুষকারকে জাগ্রত করতে পার এবং দৈবের সহায়তা লাভ করতে পার, তাহলে সমস্ত সংগ্রামে নিশ্চিতভাবে জয়ী হবে।”

(15.10.1936 - 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

এবার উল্টোরথে (১৯৮৯) পুরী গেছিলাম একা। জীবনে প্রথম আমার এই একক তীর্থযাত্রা। ওখানে গিয়ে অবশ্য আমার অতি আপন বন্ধুবর্গের সাথে দেখা হয়েছে, সে কিছুক্ষণের জন্য। গত বছর রথে পুরী গেছিলাম বাপী ও অন্যদের সঙ্গে। সেবার আমরা সকলে রথের রশি ধরে ছুটেছিলাম। জগন্নাথ স্পর্শ করে জীবন ধন্য মনে করেছিলাম।

এবার আমার আত্মোপলব্ধির যথেষ্ট সময় ছিল। মনে পড়ছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের কথা। পুরীতে যেতে কি ভালোই বাসতেন! সময় এবং সঙ্গী পেলেই পুরী যেতেন। একবার আমাকে লিখেছিলেন পুরী থেকে, "আজ জগন্নাথের দর্শন পেলাম ... কথাও হোল ...।" তখন এ কথার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করিনি। এখন চেষ্টা করি অর্থ ধরবার।

আমি যখন হেষ্টিংসে বি.টি. পড়ি আমাদের কয়েকজন ছাত্রীকে নিয়ে বিমলাদি দক্ষিণ ভারত দেখবার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমি জেদ ধরেছিলাম যাব বলে। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে যেতে ঠিক নিষেধ করেননি, কিন্তু বাপীকে রেখে যাওয়াতে তাঁর আপত্তি ছিল। বলেছিলেন, "যদি না যাও, তাহলে তোমাকে ভারতবর্ষের তিনটি জায়গা দেখাব।" মেনে নিয়েছিলাম। বাপীকে ছেড়ে যেতে আমারও খুব একটা আগ্রহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই সময় এলো ১৯৬৩-৬৪ সনে। ঐ সময়ে তিনি আমাদের নিয়ে প্রথম বেড়াতে যান পুরীতে। আমি ইতিপূর্বে পুরী যাইনি। তাই খুব উৎসাহ ছিল।

দাদা বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন, কি ভীষণ হৈ চৈ ব্যাপার! যেন পৃথিবীর একটা চরম পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। ষ্টেশনে বিদায় জানাতে লোকে লোকারণ্য। গৌরীবাবু, মনোজ চৌধুরী, মেজদা (সুধীর পালিত), বসাকবাবু, জ্যোতিদা, বুলুবাবু ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাগ ভর্ত্তি ভর্ত্তি শুধু খাবার আর খাবার। সকলেরই আশঙ্কা, এমন ভাব যেন দাদা কলকাতায় না থাকলে চরম বিপর্যয় ঘটে যাবে। ... আমি তো বাঁচলাম! কটা দিন অন্তত ঐ একই সমস্যার কথা শোনার হাত থেকে বাঁচলাম।

কপাল খারাপ আর কাকে বলে! পুরী পৌঁছলাম। খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে বাপীকে নিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত রেডিওতে ভেসে এলো– "পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর নেই।" শ্রীপ্রীতিকুমারের আর শান্তি নেই। যেখানে যেখানে রেডিও আছে সেদিকে দৌড়তে লাগলেন। এ থেকে জেড সব শুনতে হবে। আমার তো মেজাজ খারাপ। বিষোদ্গার করতে লাগলাম ঐ সময়ে মৃত্যুর জন্য। আমাদের ভালমন্দ কথাবার্তা বন্ধ। সব পরিকল্পনা গোল্লায় গেল। শুধু খবরের কাগজ খোঁজা – আর রেডিওতে কি বলছে তাই শোনা।

আমার তখন বয়স কম। কাউকে চিনিনা। চুপচাপ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ....

দু' চারদিন এমন গেল। ছেলেকে সমুদ্রে স্নান করতে শেখালেন হাতে করে। ঐটুকু ছেলেকে নুলিয়াদের কায়দায় ঢেউগুলোকে রপ্ত করবার কায়দা শেখালেন। কে বলবে এই লোকটিই কলকাতায় সারা দিনে চার পাঁচটির বেশী কথা বলেন না। অবশ্য মনের মত লোক হলে কথার অভাব হয়নি কখনও।

এর মধ্যে তাঁর ছোট পিসীমার বাড়ীতেও আমাদের নিয়ে গেলেন। সেখানে আবার পিসীমার কাছে অনুগত হয়ে বসে কথা শোনা। দেশের কত পুরনো কাহিনী! খুলনার গল্প শুনলে তাঁর আর আনন্দের শেষ থাকত না।

আমাকে ও বাপীকে হাত ধরে ধরে শ্রী জগন্নাথ দর্শন করালেন। কি ভিড়ের মধ্যে যেতে পারতেন চিন্তা করা যায় না। সাধারণতঃ কোনও উৎসবের সময় বিশেষ বিশেষ মন্দিরে যে প্রচণ্ড জনসমাগম হত শ্রীপ্রীতিকুমার সঙ্গে থাকলে সে সব জায়গায় যেতে কোনও অসুবিধাই হত না। আর কি যত্ন করে হাত

ধরে সব দেখাতেন। পৌরাণিক ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দিতেন। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিভিন্ন পুরাণ একেবারে কন্ঠস্থ ছিল। কেউ কিছু জানতে চাইলে খুব খুশী হতেন। তাঁর কাছ থেকে শুনে শুনে বাপী এই স্বভাবটি রপ্ত করেছে। আমারই বরং কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেই বোকাই রয়ে গেছি। শ্রীজগন্নাথ দর্শন হোল। প্রাণ ভরে পুজো দেওয়া হোল। দেখলাম পুরীর পাণ্ডাদেরও ওঁর প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা। যে হোটেলে আমরা থাকতাম, ঘন্টায় ঘন্টায় লোক পাঠিয়ে আমাদের সুবিধা অসুবিধার খবর নিতেন। নিজে এসে শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে ধর্মালোচনা করতেন, এবং খুব খুশী হয়ে ফিরে যেতেন।

এরপর কেনাকাটার ব্যাপার। আমাদের দোকানে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছেমত শাড়ী ইত্যাদি কেনাতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছাকাছি সকলের জন্য কোন না কোন উপহার কেনবার ইচ্ছে ছিল আমার। হয়ত অতটা খরচ করবার মত তাঁর fund ছিল না। তাই খুব বিব্রত বধ করেছিলেন। অসুবিধটা আমাকে স্পষ্ট করে খুলে না বলাতে আমিও বুঝতে পারিনি। বাক্স বোঝাই করে সবার জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলাম। ফিরে আসবার পর বলেছিলেন যে আমি যদি ঐ ধরণের কেনাকাটা করি তাহলে তাঁর পক্ষে খরচ চালান মুস্কিল হয়। তাঁর সঙ্গে কথাও যেতে হলে ঐ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। অথচ পরে কতবার হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দেরাদুন, বছরে বছরে লক্ষ্ণৌ গিয়েছি। আমাকে বরাবর আমার নিজের জন্য পছন্দমত কিছু কিনতে বলেছেন। সে ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন নি।

সবচেয়ে ভালবাসতেন পুরীর সমুদ্র ধারে বসে থাকতে। অনেক রাত পর্যন্ত বালির উপর বসে থাকতেন। ঐ সময়ের অনেক পরেও প্রায় প্রতি বছরই একবার দু'বার যেতেন। কখনও থাকতেন “পুরী হোটেলে”, কখনও “হ্যাপী হোমে”, কখনও “সী ভিউ”তে। শেষের দিকে “সোনালী”তে থাকতেন। মোট কথা বিলাসবহুল হোটেল খুব পছন্দ করতেন। বেল বাজালেই বেয়ারা ঘরে চা দিয়ে যাবে সেই রকম ব্যবস্থা না থাকলে সে হোটেল পছন্দ হোত না।

একবার ছিলেন একটি নূতন “লজে”। সেখানে খাবার ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিদিন দুপুরে সেই নুলিয়াদের পাড়ার হোটেল থেকে আমাকে মাছ ভাত কিনে আনতে হতো টিফিন ক্যারিয়ারে। সে স্বাদ ছিল খুবই খারাপ, কিন্তু কোন উপায় থাকতো না। সারাদিন উপোষ থাকবেন সেও ভালো কিন্তু খাওয়াটা অন্যের

ইচ্ছেমত কখনই করতেন না। অল্প বয়সে তো দিনের পর দিন উপোষ চলতো, কিন্তু ১৯৭৭ সালে ব্লাড সুগার ধরা পড়বার পর একটু সতর্ক হয়েছিলেন।

শেষবার পুরী গেছিলেন ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে সবাইকে নিয়ে। ক্রিশকে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ তিনিই হাতে করে খাইয়েছিলেন। দু'রাত ছিলাম। শরীর তখন খুবই অশক্ত, তবুও হাত ধরে জগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। নাতিনাতনিদের যাতে ভিড়ে কষ্ট না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর মনে কি ছিল জানি না, শেষের ঘন্টা শুনতে পেয়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে হাবভাব দেখে একবারও মনে হয় নি যে আর শ্রীজগন্নাথ দর্শনে সশরীরে যাবেন না।

আমরা যাই করি না কেন তিনি হোটেলে দুপুরে বিশ্রাম করতেন। আমি দুপুরে সমুদ্রের ধারে বেরিয়ে পড়তাম। আমার খুব আগ্রহ ছিল একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ কেনবার। শেষবার আমি একটি দোকান থেকে একটি ছোট শঙ্খ কিনে এনেছিলাম। আমার মনে কি আনন্দ! একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পেয়েছি। আমার কথা গোপন করা স্বভাব ছিল না। বলেই ফেললাম তাঁকে শঙ্খ কেনবার কথা। কি বকুনি দিলেন! বললেন আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, সব চলে যাবে। আমি সাম্লাতে পারব না ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং আদেশ দিলেন তৎক্ষণাৎ ওটি দোকানীকে ফেরৎ দেবার। খুব দুঃখে, অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে দোকানীকে ফেরত দিয়ে এলাম, অন্য জিনিষ কিছু কিনলাম। দোকানী আমার মুখ দেখে কোনও আপত্তি করে নি টাকা ফেরৎ দিতে। কিন্তু এখন ভাবি ফেরৎ দিয়েও তো আমার কিছু রইল না। আমার তো সবই চলে গেল। সর্বনাশের আর কি বাকী আছে? কেন এমন হোল? আমি তো কথা শুনেছিলাম। তাহলে?

এর উত্তর কে দেবে? তবে এটুকু বুঝি হয়তো সব যায় নি। হয়ত আরও বৃহত্তর কোনও উদ্দেশ্যে এই সব ঘটনাগুলো ঘটে গেল! হয়তো কোনও একদিন আমি এর উত্তর খুঁজে পাব।

সে দিনের আর কত দেরি ?
এর জবাব কে দেবে?
মহাকাল? ....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(** রচনাকাল - আগস্ট, ১৯৮৯)

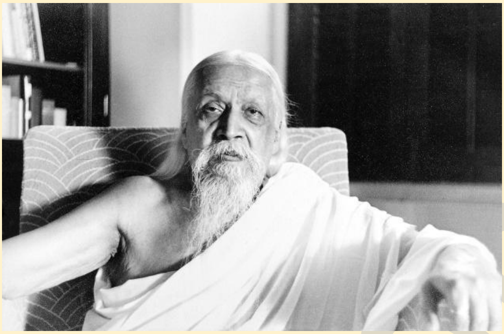

15.08.1872 – 05.12.1950

সন্ধ্যা – Evening **শ্রী অরবিন্দ**

সোনালী সন্ধ্যা এক আসে,
চিন্তামগ্ন দিনমণি যবে
যায় অস্তাচলে,
পরিহরি তার সাধারণী –
ছটার গরিমা। বৃক্ষরাজি
নত হ'য়ে আভাসে গুঞ্জন তুলি
কিছু যেন বলিবারে চায় – তাঁদের
হরিৎ সাথীরে আর ফলবতী জননীরে।।
এইসব আর নিঃশব্দ বিস্তৃত সাগর
মিলি রচে এক কালখণ্ড ভগবৎ-সান্নিধ্যে ভরা।
যেন দীর্ঘ পথ-চলা শেষে এক জরা।
বিপুল ঐশ্বর্যে ভরা ।।

DO NOT COPY

মহাযোগেশ্বর অমর আত্মা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। যোগৈশ্বর্যপূর্ণ এক মহা জীবনের দেড়শতবর্ষ পরিপূর্ণ। মহামানব মহাপুরুষের জীবন বর্ষমাসে সীমাবদ্ধ নয়। এ জীবনের অমর সত্তা সর্বকালে সর্বদেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বিশ্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দের এক মহাদর্শ শ্রীঅরবিন্দ জীবন। এ মহাযোগীর সাধনা ও আদর্শের প্রতি প্রণাম জানাই।

বৈচিত্র্যই প্রকৃতির নিয়ম। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে সমত্ববোধের জ্ঞানই অনন্ত জীবনের উপলব্ধি ও সার্থকতা। এক দেশের সহিত অন্য দেশের এক জাতির সহিত আর এক জাতির বিবাদ-বিভেদের কারণে পৃথিবী যেন দুঃখ দারিদ্র্যের শ্মশানে, যুদ্ধ ও মৃত্যুর ভয়াবহ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মানব সমাজ যখন আদর্শ জীবনের সন্ধান লাভ করে আত্মবোধে পরস্পরের সহিত মিলিত হবে, তখনই পাবে সুখশান্তিময় অমর জীবনের আস্বাদন। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনায় এর সন্ধান মিলেছে। মহামানবের সাধনার আলোকে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পণ্ডিচেরীর সমুদ্র কূলে বিশ্ববাসী মানব সমাজের মহামিলন কেন্দ্র রচিত হয়েছে।

বংশ ও পরিবারের গুণে, জাতি ও সমাজের বৈশিষ্ট্যে, পিতামাতার শিক্ষা ও সংস্কারের অনুকরণে মানব শিশুর জীবন গড়ে ওঠে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাববশতঃ শিশুগণ তাদের জাতীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ প্রকাশ করতে থাকে। কোন জাতিই একক স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। যে জাতির মধ্যে যা কিছু উত্তম তা ধারণা করেই জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে। সর্বযুগের সর্বদেশের ঋষিমুনি ও মহাপুরুষগণের মধ্যে যাঁরা সর্বকুশলতাময় মানবাদর্শ প্রচার করে গেছেন তাঁদের জীবন সত্তার অনুভূতি ও উপলব্ধি করেই আদর্শ জীবন, সমাজ জাতি ও দেশ গঠনের উপাদান মিলে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনা দেশ কালের সীমারেখার অতীত এক সার্বজনীন আদর্শ-সম্ভুত। ব্যষ্টি জীবনের মুক্তির আদর্শে ইহা সীমাবদ্ধ নয়; জগতের সীমা হতে পরিত্রাণ লাভেই এ যোগ সাধনার সার্থকতা নয়, ভগবৎ সত্তায় ডুব দিয়ে নির্বিকার, নিষ্ফল, নির্মল থাকাই এর শেষ কথা নয়। আত্মার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে বিশ্ববাসী মানবকুলের সঙ্গে একাত্মতা, সর্ব দেশের সকল মানব সমাজের পরিপূর্ন শান্তি ও আনন্দের শাশ্বত আদর্শই শ্রী অরবিন্দের যোগ সাধনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সাধনাবলে তিনি যে সত্যানুভূতি লাভ করেছেন তা যুগপৎ বিশ্বাতীত আবার

সর্ববিশ্বে পরিব্যাপ্ত ও সর্বজীবে অনুস্যূত; তিনি যে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করেছেন তা যেমন আপন দেশ ও দেশবাসীকে আত্মবৎ জ্ঞান করতে শিক্ষা দেয়, তেমনি সকল জাতি, সকল ধর্ম ও সমাজের মানুষকে এক আত্মার প্রতীকরূপে, এক ঈশ্বরের দিব্য সত্তা রূপে প্রেমের আলিঙ্গনে উদ্বুদ্ধ করে। দেশকালের সীমা মুছে দিয়ে, জাতি ও ধর্মের বিভেদ বৈষম্য দূর করে দিয়ে মানব গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যে ঈশ্বরের দিব্যসত্তারূপে বিরাজিত শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শনে তার প্রতীতি জন্মে। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের ধর্মস্থান। মন্দিরের বিভিন্ন প্রতীক। প্রত্যেক মানবের হৃদয় মন্দিরেও রয়েছে ঐ এক ভগবৎ সত্তা, এক ঈশ্বরের দিব্য আসন। বিশ্বমাঝে ও বিশ্বাতীতরূপে যে ঈশ্বর সত্তা বিদ্যমান, সর্বযুগে বিভিন্ন দেশে; ভিন্ন ভিন্ন সমাজে মানব কুলের মধ্যে ঐ একই পরমাত্মা যে বিরাজিত আছেন, তাঁর উপলব্ধি করেই শ্রী অরবিন্দ হয়েছিলেন ঋষি, যোগযুক্ত মহাযোগী।

পরমাশ্চর্য আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবন সুখকর করে তুলবার চেষ্টা করছে। প্রকৃতির গুপ্তরাজ্য যেমন বহু রহস্যজালে আবৃত, মানবমনও তেমনি বহু সংস্কারের জালে আবদ্ধ। বিজ্ঞান অদ্ভুত কৌশলে বিচার বিশ্লেষণ করে সকল সংস্কারের জটিলতা ভেঙ্গে দিতে প্রয়াস পাচ্ছে। বিশ্ববাসী মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য বিজ্ঞানবিদ, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক, ধর্মবেত্তা ও আদর্শবাদী মনীষীগণ একযোগে চেষ্টা করে চলেছেন। তবু যেন কোথায় জট পাকিয়ে আছে; মানব সমাজের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিশ্বমানব সমাজের কল্যাণ প্রচেষ্টায় জটিলতা আরও যেন বেড়ে যাচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ সর্বকল্যাণময় যোগ সাধনার দ্বারা বিশ্ববাসীর মহামিলনের পথ, মানব সমাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ও মৈত্রীমূলক মুক্ত জীবনের আদর্শধারা উন্মুক্ত করে গেছেন। আত্মসমর্পণমূলক কর্মই নিজের মুক্তি, দেশের মুক্তি, বিশ্ববাসীর মুক্তিসাধনের রাজপথ। আত্মধ্যান, ঈশ্বরোপলব্ধি ও ঈশ্বর প্রীতিমূলক কর্মের দ্বারা বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ এক একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ব নাগরিকরূপে পরিণত হতে পারে।

আত্মমন্দিরে আত্মধ্যানে নিবিষ্ট হয়েই বিশ্বকল্যাণের সূত্র আবিষ্কার করতে হবে, নিজের পৃথক সত্তা ও দেহ পিঞ্জর ভুলে গিয়ে নিজেকে বিশ্ব মানব পরিবারের একজন বলে গণ্য করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে, ব্যষ্টি জীবন বিশ্বব্যাপ্ত মহাজীবনের ক্ষুদ্র বুদবুদ মাত্র। সর্বব্যাপী ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত একাত্মবোধেই মানব জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। শ্রীঅরবিন্দের যোগযুক্ত মহাজীবন

বিশ্ববাসীকে এ আদর্শই উপহার দিয়েছে। দেশ, কাল ও জাতির সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে আত্মস্থ হয়ে এ আদর্শ উপলব্ধি করতে হবে। মূলতঃ আমরা ঈশ্বর সত্তা বা দেব সত্তায় অভিষিক্ত মানব। আত্মধ্যানের চেষ্টা করেই মানুষকে এ দিব্যানুভূতি লাভ করতে হবে, লৌকিক জীবনেই এ দিব্যসত্তার আবির্ভাব ঘটাতে হবে। যোগ সিদ্ধ মহামানব শ্রীঅরবিন্দের সাধক জীবন মানব সমাজকে এই আদর্শ যোগ সাধনার পথেই আকৃষ্ট করেছে। এই মহাজীবনের পুণ্যস্রোতে অবগাহন করে সকল দেশের সর্বসমাজের মানবগণ বিশ্বমৈত্রীর রাখীবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হ'ন, এই প্রার্থনা জানাই।

বিবেকানন্দ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

শ্রী সুনীলকুমার দাস

"India should be free, politically first..."

"There cannot be any growth without liberty. Liberty is the first condition of growth; just as man must have liberty to think and speak, so he must have liberty in food, dress and marriage and in everything as long as he does not injure others."

মনে হতে পারে এ'কথাগুলি নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক নেতার। কিন্তু তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে যখন মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়, তখন জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলেন ছিটে ফোঁটা সংস্কারের ঝুলির দিকে হাত প্রসারিত করে। স্বাধীনতার দাবী উচ্চারণ করার মতো বুকের পাটা সেদিন কোন নেতারই ছিল না। স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হয়েছিল আরও সিকি শতাব্দীর বেশী ব্যবধানে। সেদিনের অর্দ্ধজাগ্রত জাতীয় চৈতন্যের লগ্নে যাঁর কণ্ঠে স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছিল তিনি কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরেই থাকতেন। জাতীয় মুক্তির এই মন্ত্রদ্রষ্টা উদ্গাতা ছিলেন একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী - স্বামী বিবেকানন্দ।

সাধু সন্তদের সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণা তাঁরা হন জীবন-বিমুখ। পরাবিদ্যার অনুশীলন করে অপরাবিদ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন,

মোক্ষলাভের জন্য গিরিকন্দরে আশ্রয় নিয়ে যৌবনেই বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হলেন ‘কোটিকে গোটিক’ যিনি বাস্তবতাকে পরিহার না করে যুগ যুগ ব্যাপী ধর্মসাধনাকে জীবনের সাথে মেলাবার উপদেশ দিয়েছেন। বেদান্ত কেশরী বিবেকানন্দ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের শিক্ষায় জীবকে শিব বলে ঘরের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বেদান্তকে সমন্বিত করেছিলেন। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বেদান্তের সাকার বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে লোকহিতে করেছিলেন উৎসর্গ। ঊনিশ শতকে যে বাস্তব বিশ্বে বিবেকানন্দ বেঁচেছিলেন তার উষ্ণ নিঃশ্বাস তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল এই জীবনবোধ। তাই তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা এখন বেশী দরকার, দরকার ইস্পাতদৃঢ় পেশী; হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুলে দরিদ্রনারায়ণ সেবাকে কৈবল্য মুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের জাতীয়তাবোধে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় এক অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চারিত করে। বিদেশী প্রচারকদের অবিরত অর্দ্ধসত্য, মিথ্যা দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত প্রচারের ফলে এবং দেশীয় সংস্কারবাদীদের সংস্কার প্রচেষ্টার আতিশয্যে ভারতীয়দের মনে এক হীনমন্যতাবোধ বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য ছিল জোড়াতালি দেওয়া আত্মরক্ষামূলক। বিবেকানন্দের কীর্তি তাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনল, আত্মনিষ্ঠা জাগিয়ে তুলল। বৈদিক সভ্যতা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে হেয় নয়, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, ভারতেরও যে পৃথিবীর আর্ততাপিত মানুষকে শোনাবার মতো অমৃতময় বাণী আছে একথা তারা শুনলো পরম বিস্ময়ে। আকস্মিকভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল রাতারাতি – সব কিছু হয়ে গেল উল্টো পাল্টা। এতদিন যারা দিচ্ছিল ধিক্কার, তারা হয়ে উঠলো জয়ধ্বনিতে মুখর। এতে যে শুধু দেশবাসীর ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আস্থা ফিরে এল তা নয়, জাগ্রত হল তাদের জাতীয় গর্ববোধ, প্রাণবন্ত হল তাদের দেশপ্রেম। স্বদেশ প্রত্যাগত স্বামীজীকে প্রদত্ত অজস্র মানপত্রে এই মনোভাব ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। রামনাদের জনসাধারণের পক্ষে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে সারা ভারতের মানুষের মনের কথাই যেন অভিব্যক্ত হল–“পাশ্চাত্য জগতে আপনার কাজ ঔদাসীন্য–জর্জরিত ভারত মাতার সন্তানদের তাদের উত্তরাধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে সচেতন করেছে।”

এই মনোভাবই সর্বব্যাপী হয়ে জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ় বনিয়াদের উপর গড়ে তুললো।

ঝড় উঠলে তার প্রভাব চারদিকে অনুভূত হবেই। 'Cyclonic Monk' যে ঝড় তুললেন তার বেগও জনচিত্তের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ল।

'Someday I shall fall upon the society like a thunderbolt.'

সেই 'Someday' সমাগত।

১৮৯৭ খৃঃ এর প্রারম্ভ থেকে ১৮৯৯ এর মধ্য ভাগ পর্যন্ত আড়াই বৎসর কাল জাতির নবজাগরণের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এর যথার্থ তাৎপর্য, সত্যিকার মূল্য ও গুরুত্ব আজও নির্ণীত হয় নি। সে প্রচেষ্টাই হবে এ আলোচনার বিষয়বস্তু।

জাতীয় জীবনের চলার পথে যে সত্তর বছর কাল আমরা সদ্য অতিক্রম করে এলাম সে সময়ের জন জাগরণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সমাজসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যেটুকু অগ্রসর হয়েছি, সে সময়টুকুতে আমাদের যা কিছু সৃজনীক্ষমতা প্রথমতঃ এবং প্রধানত তা আমরা আহরণ করেছি এই লোকোত্তর প্রতিভাধর মণীষীর জীবনধারার সাথে সংশ্লিষ্ট এই আড়াই বছরের মূল্যবান সময়টিতে।

জাতীয় চেতনা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সংগ্রামী স্পৃহা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অমেয় প্রভাবকে আমরা তিনটি দিক থেকে পর্যালোচনা করতে পারি। প্রথম, সমসাময়িক জনচিত্তে তাঁহার দৃষ্টান্ত ও বাণীর অমোঘতার প্রভাব – সে প্রভাব অবশ্য অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত – দুই, নেতৃস্থানীয়দের উপর তাঁর প্রভাব এবং তৃতীয়তঃ তাঁর কাছে বিপ্লবী আন্দোলনের ঋণ।

দেশকালে বিধৃত পারিপার্শ্বিক বাস্তব কারণেই কোন বিপ্লব, কোন জাতীয় আন্দোলন সম্ভব হয়ে ওঠে। চিন্তা-নায়কেরা তা চিন্তার ক্ষেত্রে উপ্ত করেন, কর্মীরা কর্মের ধারায় তা রূপায়িত করেন। নবজাতকের ক্ষেত্রে শল্যবিদ্ যেমন দ্রুত আসন্নপ্রসবা জননীকে সন্তান জন্মের বেদনার হাত থেকে মুক্ত করেন, বিপ্লবীর কাজও তেমনি নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজকে ত্বরান্বিত করে যুগ-যন্ত্রণার অবসান ঘটানো । বিগত শতাব্দীর শেষাশেষি জাতীয় জীবনের জাগরণের যে ক্ষীণ স্পন্দন শোনা যাচ্ছিল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কার্য্যে ও প্রচারে এই জাগরণের বেগ

ত্বরান্বিত হয়েছিল - জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্র উর্বর হয়েছিল। তাই বিবেকানন্দকে বলতে পারি বিপ্লবী সন্ন্যাসী -- সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিপ্লবী আর বিপ্লবীদের মধ্যে সন্ন্যাসী।

১৮৯৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী নবযুগের জাগরণ মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন স্বামীজী। নব যুগের উদ্বোধন হোল ভারতবর্ষে। উত্তরকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি বিশেষ মহিমায় অভিষিক্ত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের বন্দনায়, শত শত শহীদের আত্মাহুতিতে। হয়ত তাঁরই আগমনী রচিত হয়েছিল বহু বৎসর পূর্বেই।

এই অমিতবীর্য বিরাট পুরুষ, নবযুগস্রষ্টা আচার্য, দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী আসমুদ্র হিমাচল মথিত করে চললেন জাতির আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য, অন্তরের সুপ্ত তেজ উদ্দীপ্ত করার জন্য।

দাবী করলেনঃ- মানুষ চাই – খাঁটি অকপট মানুষ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ যারা, অবিচলিত শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত যারা – এমন মানুষ।

যদি এমন একশত খাঁটি যুবক এগিয়ে আসে...সর্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসে... তবেই জাগবে ভারতবর্ষ।

বললেনঃ I have my own ideas of Patriotism. দেশের জন্য যথার্থই কি তুমি অনুভব কর? তীক্ষ্ণভাবে, তীব্রভাবে? গভীর জলের নীচে সবলে চেপে ধরলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস কোন মানুষের যে মর্মান্তিক অবস্থা ঘটে দেশের বহুযুগ সঞ্চিত দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করে তেমন অবস্থা কি তোমার ঘটেছে? তেমনি বেদনায় মুমূর্ষু? মৃত্যু যন্ত্রণায় তেমনি একান্ত অধীর? তা যদি হয়ে থাকে তবে দেশ সেবার প্রথম ধাপে তুমি পা দিয়েছ মাত্র।

এরপর, সেই তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে বজ্রদৃঢ় নিষ্ঠায় বাধাবিঘ্নের পাষাণ প্রাকার ধূলিসাৎ করে অদম্য সাহসে এগিয়ে যাবার জন্য কি কৃতসংকল্প হয়েছ?

যদি হয়ে থাক, তবে দ্বিতীয় ধাপে তোমার পা দেওয়া হয়েছে।

একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা কি আবিষ্কার করেছ তুমি? যদি এই তিনটির যুগপৎ সমাবেশ তোমার জীবনে ও চরিত্রে ঘটে থাকে – তবেই সার্থক হবে তোমার দেশপ্রেম, ফলপ্রসূ হবে তোমার পেট্রিয়টিজম্। নতুবা, ফাঁকা কথা আর সংবাদপত্র মারফৎ নিজের ঢক্কানিনাদ দুর্ভাগা ভারতবর্ষে সে নাটকীয় প্রহসন যথেষ্ট হয়েছে, এবার সেটা বন্ধ কর।

একথা তিনি বলতে পেরেছিলেন কারণ,

'India throbbed in his breast, India beat in his pulses.'

'India was his day-dream, India was his nightmare.'

'He was a born lover, but the queen of his adoration was his motherland.'

'পুরাতন জীর্ণ জাতীয় খেয়াতরীটি নূতন করে সাজিয়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ কর। সহায় হবেন ভগবান, সহায় হবেন গণদেবতা। 'তমিস্র রজনীর ভীত সন্ত্রস্ত দুর্বলতা দূরে নিক্ষেপ কর।'

'বাধা যত প্রচণ্ডই হোক, বিপদের ঘূর্ণিবার্তা যত প্রবলতায়ই আত্মপ্রকাশ করুক – উন্নত মস্তকে ও নির্ভীক প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হও, ভয় নেই।'

বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় নিষ্পেষিত, মোহাচ্ছন্ন, গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যে ক্লিষ্ট দেশ স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার অগ্নিগর্ভ, অব্যর্থ, অমোঘবাণীর মধ্যে অকস্মাৎ সঞ্জীবনী মন্ত্রের সন্ধান পেল। সমগ্র জাতির জীবনে এল বিপুল প্লাবন, উন্মত্ত জোয়ার। স্বামীজীর অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত মর্মস্পর্শী আবেদন, সুনিপুণ বাগ্মিতা, তাঁর পৌরুষ-ব্যঞ্জক অথচ নয়নাভিরাম কান্তি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। স্বামীজির আবেদন শুধু ভাবাবেগের কাছে নয় – যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণের দ্বারা দেশপ্রেমকে তিনি প্রস্তর কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন – দেশপ্রেমকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

সমগ্র জাতির ধমণীতে কর্মচাঞ্চল্য উষ্ণ শোণিত প্রবাহের ন্যায় দ্রুত লয়ে বয়ে চলল। সুপ্তোত্থিত হল ভারতবর্ষ। স্বামীজি নিজেও এই জাগরণ লক্ষ্য করলেন। বললেনঃ অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিস্ক যে বুঝিতেছে না সে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না – কোন বহিঃস্থ শক্তি ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেনা; কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।

ভারতবর্ষের জনচিত্তের কাছে ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, ত্যাগমন্ত্রে ব্রতীদের চিরস্থায়ী আকর্ষণ রয়েছে। তাই যেভাবে একদিন মহাভিক্ষু তথাগত বুদ্ধ এবং সন্ন্যাসী শংকরাচার্য জনচিত্ত মথিত করেছিলেন, ঠিক অনুরূপ ভাবেই স্বামীজিও আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। পরবর্তী যুগে গান্ধীজিও এভাবেই গণ মানসে চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

দেখা গেলঃ এক জাতি, এক প্রাণ, একতা
জাগে নব ভারতের জনতা।

এই জাগ্রত জনতা এক নতুন ঐতিহ্যবোধে, ভ্রাতৃত্ববোধে বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐক্যের দিকে পা বাড়ালো। স্বামীজি আহ্বান জানালেন সারা পৃথিবীতে বেদান্তের বাণী নূতন করে শোনাতে হবে, কারণ তাতেই নিহিত আছে ভবিষ্যৎ মানবজাতির বাঁচবার বীজমন্ত্র। দুর্বলের কথা কেউ শোনে না। তাই জাতিকে হতে হবে বলিষ্ঠ।

তাই তার দরকার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা শুধু ভারতের জন্যই নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্যও একান্ত আবশ্যক।

উত্তরকালে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে শক্তি ও চেতনার বিকাশ ঘটে তার উদ্বোধন ঘটে এভাবে, এই বজ্র নির্ঘোষে। বিংশ শতাব্দীর যে জাতীয় আন্দোলন স্বাধীনতায় পরিণতি লাভ করে, তার মূলে এভাবে সক্রিয় রয়েছে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব বাণী।

একথার স্বীকৃত রয়েছে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর বক্তব্যে – "বিবেকানন্দই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক – আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও স্বাধীনতার পিতা।"

ঊনিশ শতকের শেষ দশক থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন তাঁদের সকলের উপরেই ছিল স্বামীজির প্রভাব।

লাল-বাল-পাল তাঁদের উপর এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মারফৎ। তিলক কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যস্ততার মধ্যেও ছুটে গিয়েছিলেন বেলুড়ে স্বামীজির কাছে।

অন্যান্য নেতৃত্বৃন্দও হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন আশ্রম প্রাঙ্গণে।

লাজপত রায়ের অভিমত হচ্ছে বিবেকানন্দই জাতীয় সহনশীলতার নয়া মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে পরবর্তীকালে দেশপ্রেমিকরা সংকীর্ণ গোষ্ঠী ও আঞ্চলিকতার মানসিকতা ত্যাগ করে এক জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পেরেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সর্বধর্ম সমন্বয় ও সকল মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারতো না।

গান্ধীজি বললেন, "I have gone through his work thoroughly and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousand-fold."

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ভাষা শিক্ষক দীনেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন, "অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করতেন। আমাকে বলতেন, স্বামীজির ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবের এরূপ ঝংকার অন্যত্র দুর্লভ।"

DO NOT COPY

এই তেজ, এই শক্তি যে অরবিন্দে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীঅরবিন্দকে বলা চলে স্বামীজির মননশীলতার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। তাঁর মতে - "বিবেকানন্দ ছিলেন আত্মশক্তির মূর্ত বিগ্রহ, নরকেশরী। তাঁর প্রভাব আজও প্রচন্ডভাবে সক্রিয় রয়েছে অনুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কীভাবে এবং কোথায়। মনে হয় শুধু – যেন কোন সিংহবিক্রম অন্তর্মূখী উর্ধায়িত মহাশক্তি ভারতের আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আর আমরা বলি - দেখ, দেখ, বিবেকানন্দ তাঁর চির জননীর, তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজও চিরজীবি।" আবার, "ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি বিবেকানন্দ। তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠন করেছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা।

তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীর সাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেন, তুই যে বীর রে!

আমাদের যুবকগণকে এই বীরভাবে সাধনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভবিষ্যতবাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে – 'তুই যে বীর রে'।"

শ্রীঅরবিন্দ যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন তাতে তিনি যুবকদের 'বেপরোয়া' হইয়া দেশের কার্য করিতেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শক্তি ছিল পিছনে। আন্দোলন তার গুপ্তদল সহ এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে, রাজনীতি যেখানে মজ্জাগত এমন যে কোন দেশে সেটা ফরাসী বিপ্লবের রূপ নিত।"

স্বামীজির চিন্ময় সত্ত্বার পরম প্রকাশ শ্রীঅরবিন্দে। আবার, স্বামীজির মানস-কন্যা, তপস্বিনী বিপ্লবিনী নিবেদিতার সাহচর্য ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক নায়কত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বিবেকানন্দের রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিল নিবেদিতার কর্মতৎপরতা। অরবিন্দের নিজের কথায়, "বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই নিবেদিতা রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ নিজেও রাজনীতি বিষয়ে ভাবতেন। একবার একটা vision দেখেন, অনেকটা মানিকতলা বাগানের সাথে তার মিল আছে।"

সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের মতো চঞ্চল হয়ে সাংসারিক জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে পথ চলতে চাইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর গৈরিক বর্ণের পরিধেয় নয়, মনকে রঙিন করে পুরোপুরি রাজনৈতিক আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বৈরাগ্যের উত্তরীয়

অঙ্গে জড়িয়ে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করলেন। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণেই বিবেকানন্দের প্রভাব পড়ে সুভাষচন্দ্রের উপর। "হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিষই এতদিন ধরে আমি চাইছিলাম।... আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ।... চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে বিবেকানন্দই ছিলেন আমার কাছে আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।

আবার, "আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন। তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব।" সুভাষচন্দ্র যে আপোষহীন সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল মহাকাশে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো ভাস্বর অপর এক আপোষহীন সংগ্রামী– বিবেকানন্দের ঐশী প্রেরণা। সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ দিলীপ কুমার রায়ের সাক্ষ্য - "স্বামীজীর দেশ ভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষচন্দ্রকে আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছিল, এ আমার কথার কথা নয়। বিনিদ্র রাতে কতদিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার, শুধু এদেশে নয়, বিলেতেও। তাই আমি অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি, তেমনি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজীর দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই।" বিবেকানন্দের সর্বসত্বাই যেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ পুরোপুরি রাজনীতিক হলে যা হতেন তাই সুভাষচন্দ্র।

"Calm and silent and steady work and no newspaper humbag, no name making."

"India wants the sacrifice of at least a thousand of her men – men, and not fruits."

স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিঃশব্দে অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে তিলে তিলে দুঃখ, নির্যাতন, অনশন বরণ করে, বুলেট বিদ্ধ হয়ে ফাঁসির রজ্জুতে আত্মোৎসর্গের পথে এগিয়ে এসেছিলেন যে নচিকেতা-দধীচির দল তারা বাংলা তথা ভারতের সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল বিপ্লবী দামাল তরুণেরা। কতকগুলো ছেলে ঠিক করল মরতে হবে। নিজেরা মরে অপরকে বাঁচতে শেখাতে হবে। তাঁরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মরণ আগুনে। গেয়ে উঠল, "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ।" এঁদের নিয়েই গড়ে উঠলো বাংলার বিপ্লবী

আন্দোলন। বিবেকানন্দ এঁদের টেনে ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কথাগুলি এঁদের প্রাণের তরীতে অনুরণিত হয়েছিল।

১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর আর কোন দেবতা নয় – দেশজননী আর দরিদ্র নারায়ণই হবে একমাত্র উপাস্য।

১৮৯৭ থেকে ৫০ বৎসর ১৯৪৭ সাল। স্বাধীন ভারতের ভারতের অভ্যুদয়। এই সালটিকেই কি চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি। এই পঞ্চাশ বছরে স্বামীজীর চিন্তা কল্পনা কর্মতপস্যা থেকেই প্রধানত উদ্ভূত হয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন নানা ছন্দে নানা ধারায় রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বিবেকানন্দের অবদান সম্বন্ধে আমরা তাঁর দেশবাসীরা ততটা সচেতন নই। কিন্তু মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ঠিকই লিখেছেন–

"If the generation that followed, saw three years after Vivekananda's death the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India to-day has definitely taken part in the collective action of organized masses, it is due to the initial shock to the mighty Lazarus, come forth! Of the message from Madras."

আবার অন্যদিকে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইংরেজের চোখেও বিবেকানন্দের কার্যকলাপ এড়ায়নি।

কুখ্যাত Sedition Committee রিপোর্টে বলা হয়েছে, "His writings and teachings have deeply impressed many educated Hindus."

এছাড়া একাধিক ইংরেজ লেখক স্বদেশী যুগে বিবেকানন্দকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য দায়ী করেছিল। এ অভিযোগ ঠিক না হলেও এর পেছনে কিছুটা সত্য আছে।

অগ্নিযুগের সকল প্রথম সারির বিপ্লবী অকপটে স্বীকৃতি জানিয়েছেন বিপ্লবী আন্দোলনের উপর বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রভাবের – অকুন্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বামীজীর প্রতি।

অনুশীলন কমিটির স্থাপয়িতা সতীশ চন্দ্র বসু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে উল্লেখ করেছেন স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত। ভারত আবার বড় হবে, এটা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষবৎ ছিল। সতীশচন্দ্র

আরও বলেন, দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উৎসাহ স্বামী বিবেকানন্দ দিতেন। এই উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়েই অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে কি কোন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? তিনি নিজে কি এগিয়ে গিয়েছিলেন বৈপ্লবিক তরঙ্গের আবর্তে ঝাঁপ দিতে, সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সশস্ত্র বিদ্রোহ? স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর ডাঃ ভূপেন দত্ত, যিনি ভারতে এবং বহির্ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন উত্তর দিয়েছেন, 'হ্যাঁ'। এ বিষয়ে কোন ইতিহাস-নিষ্ঠ প্রমাণ উত্থাপন করা অসম্ভব। ডাঃ দত্ত যে বিবরণ রেখে গেছেন তার সবটাই শোনা কথার উপর নির্ভর করে।

১৯০১ সালে যে বিপ্লবী সংস্থার উন্মেষ ঘটে বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলে Sister Christineএর কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে স্বামীজী বলেন,

"What does Nivedita know of Indian conditions and politics? I have done more politics in my life than she! I had the idea of forming a combination of Indian princes for the overthrow of the foreign yoke. For that reason, from the Himalayas to Cape Comorin I have tramped all over the country. For that reason I made friends with the gun-maker Sir Hiram Maxim. But I got no response from the country. The country is dead."

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরো কয়েক বছরের ব্যবধানে যখন অরবিন্দ ও বারীণ ঘোষ বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করে নূতন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে এবং সত্যিকারে বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। আর বিবেকানন্দ দেখলেন দেশ তখনো প্রস্তুত নয়। সর্বাগ্রে চাই জনচিত্তের উদ্বোধন। তাই তিনি সেদিকে দৃষ্টি দিলেন, কর্মক্ষেত্র পাল্টালেন।

বিপ্লবী দল গড়ে তোলা নিয়ে অন্য যা কিছু বিবেকানন্দ করেছিলেন তিনি তার বিবরণ Sister Christine কে বলেছিলেন। কিন্তু সিস্টার মন্ত্রগুপ্তির জন্যে তার বিবরণ ডাঃ দত্তকে প্রকাশ করেন নাই।

প্রথম বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রথম সারির অনেকেই নাকি স্বামীজীর বিপ্লবী প্রচেষ্টার কথা জানতেন। ডাঃ দত্তের প্রবীন সহযোগী, বিপ্লব-কর্মী ও লেখক সখারাম গণেশ দেউস্করকে স্বামীজী নিজেই নাকি সে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন বেলুড়ে বসে। তাঁকে স্বামীজী আরও বলেছিলেন,

"The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it, I will see the revolution in my life-time."

মহাসমাধির কিছুদিন আগে ১৯০২ সালে বেলুড়ে সাক্ষাৎপ্রার্থী তরুণ অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে বলেছিলেন "What India needs to-day is bomb." আর ১৯০৮ সালেই বাংলায় বোমার আবির্ভাব।

বিপ্লবী আন্দোলনের সবটাই প্রায় থাকে গোপন। নানা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ, সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিপ্লবীর বিবরণ থেকে সত্য ইতিহাসটুকু উদ্ধার করতে হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ডাঃ দত্তের বিবরণের সত্যতা যাচাই করার কোন পথই খোলা নেই।

পাঠক তার অভিরুচি অনুযায়ী এ বিবৃতির সত্যতা মেনেও নিতে পারেন, আবার অগ্রাহ্যও করতে পারেন।

ভূপেন বাবু আরও লিখেছেন, ম্যাৎসিনি ও গ্যারীবল্ডীর জীবনী এবং স্বামীজীর গ্রন্থাবলীই ছিল বিপ্লবীদের প্রধান প্রেরণার উৎস। বাংলার বিপ্লবী দলগুলির পরিচালিত প্রতিটি আখড়ায় স্বামীজীর "কলম্বো হইতে আলমোড়া" বইটি পঠিত হত। ১৯০২ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত স্বামীজীর বইগুলিই সর্বাধিক সংখ্যায় বিক্রিত হত। এগুলি ছিল বিপ্লবীদের নিত্যসঙ্গী।

স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যা মিস ম্যাকলিয়ড ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় ডাঃ দত্তকে বলেছিলেন যে, গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ডেনহ্যাম তাঁকে বলেছেন, যখনই তারা কোন বিপ্লবীর আস্তানায় তল্লাসী করেছেন তখনই তারা প্রতিক্ষেত্রেই স্বামিজীর বই পেয়েছেন। ডাঃ দত্তের বিবরণের এ অংশ অন্যান্য বিপ্লবীদের বিবৃতি থেকেও সমর্থিত হয়।

সরকারী কোপদৃষ্টি স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উপর বর্ষিত হয় এবং তারা এ প্রতিষ্ঠানকে বেআইনি ঘোষণা করার কথাও ভাবতে থাকেন।

ডাঃ ভূপেন দত্ত আর একটি খবরও পরিবেশন করেছেন যাতে নূতনত্ব আছে। টলস্টয় বিবেকানন্দের জীবন ও রচনায় বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও বাংলায় ও ভারতে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বিবেকানন্দকেই

পরোক্ষে দায়ী করেন। বিপ্লবী ডাঃ তারকনাথ দাসকে লিখিত টলস্টয়ের পত্রে পূর্বোক্ত মনোভাব প্রকাশ পায়।

ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, ‘যুগান্তর’ দলের সর্ব্বোচ্চ পরিষদের সদস্য, বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়ের আবাল্য সুহৃদ হরিকুমার চক্রবর্তী যাঁর সম্বন্ধে তাঁর আত্মচরিতে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন বিপ্লবী আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাবই সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন এভাবে হত কিনা সন্দেহ। ১৯১৮ সালে তিনি যখন ঢাকা সেলুলার জেলে বন্দী তখন তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি বিবেকানন্দের ভক্ত কিনা। গভর্ণর বাহাদুরের প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে কার প্রভাব আছে যাচাই করে নেওয়া। বিবেকানন্দের বই পড়লে বিপ্লবীরা বেশী শক্তি পেতেন। স্বামীজির কথাকে তাঁরা অভ্রান্ত বলে জানতেন। তাই পুলিশ সার্চ করে সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবীদের কাছে স্বামীজির বই পেতেন। এমন কোন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়ীতে বিবেকানন্দের কোন না কোন বই ছিল না। হরিকুমার আরও বলেছেন তার সহ যোদ্ধারা সকলেই – নরেন ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালের এম. এন. রায়), উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী যতীন রায়, আশু দাস, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় –এইসব বড় বড় বিপ্লবীরা সকলেই ছিলেন স্বামীজির ভক্ত।

যতীনদা (বাঘা যতীন) বলতেন, “স্বামীজি কত বড় ছিলেন তার ধারণা করবে কে? তাঁর কথা যদি ভারত শোনে ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?”

যতীনদা ছিলেন ভোলা গিরির শিষ্য। তবু স্বামীজির প্রতি তাঁর এই ভাব।

বিপ্লবীরা জন জাগরণকে যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন সেটাকে তাঁরা বিবেকানন্দের আদর্শ বলে মনে করতেন।

‘যুগান্তর’ বিপ্লবী গোষ্ঠীর ‘মস্তিষ্ক’ বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, তিনি যখন ১৯০৫ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের সামিল হন তখন প্রধানতর প্লাবণীশক্তি ছিল বিবেকানন্দের বাণী। “চরিত্র গঠন কর, মানুষ হও, সমাজসেবা ব্রতে এগিয়ে পড়, দেশকে মা জ্ঞানে পূজা কর, সমাজের দুর্বলতা দূর কর, কেন্দ্রীভূত হও, অভি মন্ত্রে দীক্ষিত হও। সমাজে যারা অনুন্নত, হীন, দরিদ্র, মূর্খ, নিপীড়িত তাদের সেবায় লেগে যাও।” এ সবই বিবেকানন্দের দেওয়া কর্মতালিকা, আর এ কর্মতালিকা বিপ্লবীদেরও।

DO NOT COPY

বিপ্লবী জীবনের আত্মিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য বিপ্লবী সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন অনুভূত হলে দেশ বিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস পাঠের সাথে সাথে স্বামীজির লেখা ও বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেতে সচেষ্ট হন বিপ্লবীরা। স্বামীজি অবশ্য বলেননি ইংরেজকে ধর, মার, কাট। কিন্তু আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নুতন যুগের আগমনী বার্তা শুনিয়াছেন।

বিপ্লবী সংস্থা বি. ভি.-এর প্রতিষ্ঠাতা সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মহাজাতি সদনের অছি পরিষদের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণে জানা যায়, "১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঢাকায় আমার প্রথম দেখা। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ পাল। স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় দিন কতিপয় বন্ধুসহ আবার তাঁর কাছে যাই। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ পেলাম। অপুর্ব এক চৈতন্যলোকে নিয়ে গেল তাঁর বাণী। তিনি বলেছিলেন - পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তাঁদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া। সেই দিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব ধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম।"

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Vivekananda - Prophet and Patriot-এ সন্নিবিষ্ট দীর্ঘ পত্রে হেমচন্দ্র লিখেছেনঃ

"স্বামীজী আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন - তোরা অমৃতের পুত্র। ... ঐ স্পর্শ, ঐ কন্ঠস্বর আমাদের রক্তে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া দিল। আমরা মুহূর্তে উৎসাহিত হলাম, উদ্বুদ্ধ হলাম, অন্তহীন পথ চলার আবেগে থরথর কেঁপে উঠলাম।"

"স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন আমার কাছে ধর্মগুরু হয়ে আবির্ভূত হন নি, তিনি দেখা দিয়েছিলেন সুদূর দ্রষ্টা রাজনীতিজ্ঞ রূপে। চিরকাল এই রাজনীতিক মহাগুরুর কথা স্মরণ করে এসেছি। ভবিষ্যতে অজস্র বন্ধু বান্ধবসহ অতি বিনম্র চিত্তে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে - সুখী ভারতজননীর ক্রোড়ে সমৃদ্ধ বাংলার স্থান করে দিতে, বাসযোগ্য নূতন পৃথিবীর কল্পনাকে বাস্তব করে তুলতে।"

বিবেকানন্দ শুধু স্বাধীনতা কামনা করেন নি, সেই স্বাধীনতার ফল যাতে কোটি কোটি উপেক্ষিত ভারতবাসীর করায়ত্ত হয় সে কামনা ছিল তাঁর।

তাই তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব “I am a Socialist.” বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীর কথা আবার উদ্ধৃত করে বলিঃ

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমাজতন্ত্র দেশে দেশে ভিন্ন রূপ নেবে। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র তার সভ্যতার ভিত্তিকে ত্যাগ করতে পারে না। সে ভিত্তি আধ্যাত্মিকতার। সমাজতন্ত্রকে ভারতের সাধনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। স্বামীজী, শ্রীঅরবিন্দ এই সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর উচিৎ স্বামীজীর রচনার মধ্যে ফিরে যাওয়া। দেখতে হবে সেখানে কি আছে, তিনি কোন পন্থা নির্দেশ করেছেন। যদি বিবেকানন্দের পথে সমাজতন্ত্রের আন্দলন করা যায় তবে তার সফলতা সুনিশ্চিত।”

আর তা যদি সম্ভব হয়, সুদূর অতীতে বিবেকানন্দের যে প্রেরণা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ফলপ্রসূ হতে আরম্ভ করেছিল, তা লাভ করবে এক সার্থক পরিণতি।

সাধু নাগ মহাশয়ের অলৌকিকত্ব

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে সাধু নাগ মহাশয় ছিলেন অন্যতম। তাঁর জীবন বড় সুন্দর। গোড়া থেকেই নানা প্রকার অলৌকিক ভাবে পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রখ্যাত জীবনীকার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেনঃ ‘সুরেশ বলেন, ভাবোন্মত্ততার সময়ে প্রবল ঐশ্বানুরাগের লক্ষণ সকল নাগ মহাশয়ের শরীরে সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইত।

‘কিন্তু যতই বিশ্বাস অনুরাগ থাক, বিধিপূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধন ভজন না করিলে ইষ্টদর্শন হয় না – এক সাধুর মুখে এই কথা শুনিয়া, নাগ মহাশয় দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইল। কোথায় গুরু পাইবেন, কে তাঁহাকে মন্ত্র দিবে– নিরন্তর এই ভাবনা। গঙ্গাকূলে সময় সময় অনেক সাধু সজ্জনের সমাগম হয়, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন– এই আশায় তিনি অনেক

রাত্রি পর্যন্ত গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, নাগ মহাশয় একদিন কুমারটুলীর ঘাটে স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, একটি মাত্র আরোহী লইয়া একখানি এক মাল্লাই ডিঙ্গি ঘাটের দিকে আসিতেছে। বিক্রমপুরী ডিঙ্গি তাহাঁর কৌতূহল আকর্ষণ করিল। ঘাটে লাগিলে দেখিলেন, নৌকার আরোহী তাঁহাদেরই কুলগুরু কামারখারাবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নাগ মহাশয় তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া উঠিয়া গুরুদেবের পদধূলি লইয়া, হঠাৎ নৌকাযোগে তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বঙ্গচন্দ্র বলিলেন, বাবা, মহামায়ার আদেশে তোমাকে মন্ত্রদীক্ষিত করিতেই এখানে আসিয়াছি। নাগ মহাশয় বুঝিলেন–তাঁহার কাতর প্রার্থনা করুণাময়ী জগজ্জননীর কর্ণগোচর হইয়াছে। তাঁহার বাসা তখন কাশীমিত্রের গলিতে; পরমানন্দে বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তথায় লইয়া গেলেন। কুলগুরুকে দেখিয়া দীনদয়ালেরও আহ্লাদ অবধি রহিল না, কারণ তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ধর্মোন্মাদ পুত্র কুলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরদিন শুভদিন ছিল, নাগ মহাশয় সস্ত্রীক শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ডিঙ্গি কুমারটুলীর ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। সেদিন নাগ মহাশয়ের দীক্ষা হইল, তাহার তিন চারিদিন পরে বঙ্গচন্দ্র বিক্রমপুর রওনা হইলেন। কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার জন্য দীনদয়াল নাগ ও নাগ মহাশয় তাঁহাকে বিস্তর মিনতি করিলেন কিন্তু বঙ্গচন্দ্র রহিলেন না।

‘দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নাগ মহাশয় সাধনার অগাধ সলিলে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। জপ-ধ্যানে রাত্রি পোহাইয়া যাইত। অমাবস্যায় উপবাস করিয়া গঙ্গাকূলে বসিয়া জপ করিতেন। জপ করিতে করিতে সময় সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া জপ করিতেছিলেন, জোয়ার আসিয়া তাহার অচেতন দেহ ভাসাইয়া লইয়া যায়, সংজ্ঞা হইলে তিনি সাঁতার দিয়া উঠিয়া আসেন।’

নাগ মহাশয়ের অলৌকিক লীলা প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অন্যত্র লিখেছেনঃ

‘...শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে যখন অহরহ অন্তর্দ্দাহ হইতেছে, সেই সময় একদিন নাগ মহাশয়কে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “ওগো, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বস! তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে!” বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ নাগ মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া রহিলেন।’

অন্যত্র চক্রবর্তী লিখেছেনঃ

'সুরেশ কোয়েটা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সেই ডাক্তার কোথা? সে নাকি খুব ডাক্তারী জানে? তাকে একবার আসতে বলো তো।" সুরেশ আসিয়া নাগ মহাশয়কে জানাইলেন। নাগ মহাশয় কাশীপুরে উপস্থিত হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ওগো এসেছ? তা বেশ হয়েছে। এই দেখ না ডাক্তার কবিরাজেরা ত সব হার মেনে গেছে। তুমি কিছু ঝাড়ফুঁক জান? জান ত দেখ দিকি যদি কিছু উপকার করতে পার!" নাগ মহাশয় নত মুখে একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাংঘাতিক ব্যাধি মানসিক শক্তি বলে নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। সহসা তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব উত্তেজনা দেখা দিল, বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব জানি, এখনই রোগ সারিয়ে দেব।" বলিয়া ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে আপনার নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি পার, রোগ সারাতে পার!"

নাগ মহাশয়ের অলৌকিকত্বের বিষয় নিয়ে শরচ্চন্দ্র অন্যত্র লিখেছেনঃ "ঠাকুর অপ্রকট হইবার পাঁচ সাতদিন পূর্ব্বে নাগ মহাশয় আর একদিন তাঁহাকে দেখিতে যান। ঘরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "এ সময় কি কোথাও আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা কেমন বিস্বাদ করিয়াছে, আমলকী চিবুলে বোধ হয় পরিষ্কার হত!" উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহাশয়! এখন ত আমলকীর সময় নয়, কোথায় পাওয়া যাবে? নাগ মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে যখন আমলকীর কথা বাহির হইয়াছে, তখন নিশ্চিত কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। তিনি জানিতেন, ঠাকুরের যখন যাহা অভিলাষ হইত, যেকোন প্রকারে হউক তাহা আসিত। নাগ মহাশয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমলকী অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমে দুই দিন, আড়াইদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, নাগ মহাশয়ের দেখা নাই। এই সময়ে তিনি কেবল বাগানে বাগানে আমলকী অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিন দিনের দিন আমলকী লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। আমলকী পাইয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে বলিলেন, "আহা, এমন সুন্দর আমলকী তুমি এই অসময়ে কোথা থেকে জোগাড় কোরলে?"

বারদীর ব্রহ্মচারীকে দেখবার জন্যে এক সময় তারাকান্ত নাগ মহাশয়কে অনুরোধ করেন।

একবার তাঁর একান্ত পীড়াপীড়িতে নাগ মহাশয় গেলেন বারদীর ব্রহ্মচারীকে দেখতে। যাবার সময় তিনি নারায়ণগঞ্জ হতে কিছু ফল ও মিষ্টি

কিনে নিয়ে যান। ব্রহ্মচারীর সামনে উপস্থিত হয়ে নাগ মহাশয় সেই ফল ও মিষ্টি তাঁকে নিবেদন করলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী সেগুলি স্পর্শ করলেন না। কাছেই একটি ষাঁড় দাঁড়িয়েছিল। তিনি সেসব দ্রব্য ষাঁড়টাকে খেতে দিলেন। তারপর ব্রহ্মচারী নাগ মহাশয়ের শুকনো ও দীনহীন বেশ দেখে তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন। নাগ মহাশয় তার কোন উত্তর দিলেন না।

তাঁকে নিরুত্তর থাকতে দেখে ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুবাক্য বলতে লাগলেন। সেগুলি সহ্য করতে পারলেন না নাগ মহাশয়। তিনি ব্রহ্মচারীর ওপর ভীষণ রেগে গেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগলো।

এমন সময় তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছে এক ভীমাকৃতি কৃষ্ণপিঙ্গল ভৈরব মূর্তি। সে নাগ মহাশয়ের কাছে অনুমতি চাইছে ব্রহ্মচারীকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে।

তাই দেখে অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলেন নাগ মহাশয়। পরে তিনি বলতে লাগলেন, হায় ঠাকুর! তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কেন আমি সাধু দেখতে এখানে এলুম। কেন আমার মতিভ্রম হল।

এই বলে তিনি মাটিতে মাথা খুঁড়তে লাগলেন। তারপর ঠাকুরের নাম নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন।

নাগ মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আরও লিখেছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী; 'বারদীর ব্রহ্মচারীর এক শিষ্য ছিলেন, তিনি কখন কখন নাগ মহাশয়ের নিকট আসিতেন। এই ঘটনার পর শিষ্য আসিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মচারী শাপ দিয়াছেন, মুখে রক্ত উঠিয়া এক বৎসরের মধ্যে আপনার মৃত্যু হইবে। নাগ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তা আমার একটি রোমও নষ্ট হইবে না।" বৎসর পার হইয়া গেল, শাপ বিফল হইল দেখিয়া, শিষ্য বারদীর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া নাগ মহাশয়ের অনুগত হইলেন, এবং জ্ঞানপথ ছাড়িয়া ভক্তিপথে ত্বরায় উন্মত্ত হইলেন।

আর এক জায়গায় শরচ্চন্দ্র লিখেছেনঃ 'তিনি মধ্যে মধ্যে আমার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেন। একই শ্লোকের পৃথক ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিতেন, "তাও বটে, আবার তাও বটে। যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য শাস্ত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। ইহাতে ব্যাখ্যা কর্তাদের কোন দোষ নাই। ঠাকুরের বহুরূপীর গল্প উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বরের অনন্তরূপ যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, তিনি সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কি যে স্বরূপ কেহই কিছু বলিতে পারে না।" তারপর মণ্ডপোপরি অবস্থিতা দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এও সব সত্য। এই দেবদেবীর

সাধনা করিয়া কত লোক মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। বলিয়া বার বার দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দ্রব্যসম্ভারে মণ্ডপ পরিপূর্ণ, পুরোহিত পূজা করিতেছেন। নাগ মহাশয় পুনরায় দেবীমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–"মা যে সাক্ষাৎ বিদ্যারূপিনী। এঁর কৃপা না হলে কি সেই অবিদ্যার পারে যাইতে পারে? মা আমাকে মূর্খ করিয়া খুদ্দুর শুদ্দুরের ঘরে আনিয়েছেন, আমাদের শাস্ত্রাধিকার নাই, আপনি শাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে কৃপা করুন! দেবতায় তাঁহার তাদৃশ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল –নাগ মহাশয় বোধহয় দেবতাসিদ্ধ; ব্রহ্মজ্ঞও নহেন। আমি এইরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে আম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তাঁহার পূর্ণ ভাবাবেগ – বলিলেন "মা কি আমার এই খড় মাটিতে আবদ্ধ? তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী; মা যে আমার মহাবিদ্যাস্বরূপিনী! বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় আধ ঘন্টা পরে সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতাঠাকুরাণীকে আমি এ কথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা তুমি তো আমার এই অবস্থা আজ নতুন দেখিলে। এক একদিন দুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক একদিন আমার মনে হয় তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝি বা চলিয়া গেলেন।

নাগ মহাশয়ের অলৌকিক লীলার ইয়ত্তা নেই। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন "কাহারও মনে কোন সন্দেহ উঠিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইত না, তিনি আপনা হইতে কথা তুলিয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। কে কেমন আচার, কাহার কি মনের ভাব, তিনি মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন। কত লোকের সম্বন্ধে তাঁহার কত কথা অবিকল সত্যে পরিণত হইয়াছে। কেহ দেওভোগে আসিবার পূর্বে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিতেন আজ অমুক লোক আসিতেছেন, আমাকে এখনি বাজারে যাইতে হইবে। যাঁহাকে স্মরণ করিতেন, তিনিই তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইতেন।

অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ নাগ মহাশয়ের পুণ্যপ্রভাবের সংস্পর্শে এসে ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেনঃ

'আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী একবার আমার সঙ্গে নাগ মহাশয়কে দেখিতে যান। অশ্বিনীর শূল বেদনা ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত তাঁহাকে এক প্রকার মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। দেওভোগের পথে সন্ধ্যা হইতে আমার ভয় হইয়াছিল আমি কেবলই ভাবিতেছিলাম, কখন তাঁহার বেদনা ধরে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পথটা নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। অশ্বিনীবাবু আমায়

আশ্বস্ত করিয়া বলিলেল, “বেদনা ধরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পাঁচ মাস রাতে জলগ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সে রাত্রে অশ্বিনী প্রচুর আহার করিয়া শয়ন করিলেন।

এই প্রসঙ্গ আর একটি ঘটনার কথা লিখেছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ‘একবার দেওভোগের একটি ব্রাহ্মণ বালকের বিসূচিকা হয়। তাহার বিধবা জননী মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে নাগ মহাশয়ের বাটীতে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান। ঈশ্বরেচ্ছায় বালকটি আরোগ্যলাভ করে।’

নাগ মহাশয়ের অলৌকিক বিভূতির প্রভাবে অনেক সময় প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন হতে দেখা গেছে। অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়েছে। বনের নদীকে ঘরে নিয়ে এসেছেন নাগ মহাশয়। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বেশ সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ এক কাহিনী লিখেছেনঃ

‘যে বৎসর অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়াছিল, যোগের তিন চারি দিন পূর্বে নাগ মহাশয় একবার দেশে যান। তাঁহাকে তেমন সময় বাটী আসিতে দেখিয়া দীনদয়াল বলিলেন, “এই গঙ্গাস্নান যোগে কত লোক সর্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিতেছেন, আর তুই সেই গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিলি! তোর ধর্মকর্ম মর্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এখনও তিন চারিদিন সময় আছে, আমাকে একবার ভাগীরথীর তীরে লইয়া চল। নাগ মহাশয় বলিলেন, “যদি মানুষের যথার্থ অনুরাগ থাকে, মা ভাগীরথী গৃহে আসিয়াই দর্শন দেন। তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না। ক্রমে গঙ্গাস্নানের দিন আসিল। শ্রীমতী হরকামিনী শ্রীযুক্ত কৈলাশ বসু প্রভৃতি নাগ মহাশয়ের ভক্তগণ সেদিন দেওভোগে উপস্থিত ছিলেন। যোগের সময় শ্রীমতী হরকামিনী দেখিলেন, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর পূর্ব দিকের ঘরের অগ্নিকোণে প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া প্রবল বেগে জল উঠিতেছে। জল জমে কলকল নাদে প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাগ মহাশয় গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। লোকের কলরবে বাহিরে আসিয়া, “মা পতিত পাবনী! মা ভাগীরথী! বলিয়া উৎসের সন্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণতি হইলেন; পরে সেই জল অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া মাথায় দিয়া আবার প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর বাড়ীর সকলে স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। সংবাদ পাইয়া ক্রমে পল্লীর লোক দলে দলে আসিয়া স্নান করিতে লাগিল। “জয় গঙ্গে! জয় গঙ্গে!” রবে নাগ মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বন্ধু **সুনন্দন ঘোষ**

সময়ের স্রোতের সাথে ভেসে আসে নিত্য নতুন বলিরেখা --
গ্লুকোমা - ক্যাটারাক্ট - আর.সি.টি. - ওয়াকার --
সদ্য কেনা আয়নাতেও নিজের মুখ ঝাপসা লাগে।

প্রকৃতির ধারায় ভেসে প্রিয় মানুষেরা চলে গেছে অগস্ত্য যাত্রায়।
আহার থেকে আশ্লেষ --- মোহের উপাদানগুলো
জমা পড়ে গেছে কালের দেরাজে ।
একাকীত্বের দুর্গে কালচক্র গতিহীন!

শৈশব থেকে একসাথে বেড়ে উঠেছিলাম যারা,
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম গরম ভাতের খোঁজে,
অফিসে, আদালতে, কলেজে, নির্মাণে --
সাল --- মাস ---- বছর --- দশক ----
কেউ হারিয়েছে অন্ধকারে, কেউ বিস্মৃতিতে।

এটলান্টিক স্যামন বাদল তুফান ফাঁকি দিয়ে
সমুদ্র থেকে উজানে লবণের স্বাদ চিনে চিনে ফিরে আসে
ক্ষরণের জন্য সেই নদীর বুকে যেখানে সে জীবন পেয়েছিল।

মানুষকেও ফিরতে হয় অতীতের দাঁড় বেয়ে।
দাসত্বের দিনের সঙ্গীরা যখন পেরিয়ে যায় মুক্তির সীমানা,
অগ্রজ, অনুজ, সন্তান সন্ততিরা বন্দী হয়ে যায় সময়ের খাঁচায়,
যখন নিঃসঙ্গ আকাশে আমিই সুর্য, আমিই পৃথিবী,
কৈশোরের আলগা হয়ে যাওয়া মুঠোগুলো নতুন করে
একে অপরকে জড়িয়ে ধরে দ্বিতীয় শৈশবে।

আমার নির্জন দরজায় আবার অতিথির আবাহন,
আমার প্রতীক্ষায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে তার নিঃসঙ্গ দ্বারপ্রান্তে।